বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ

বাংলা বিভাগ

প্রকল্পের শিরোনাম:- কবিকঙ্কন মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল: প্রান্তিক বাঙালির সমকাল

প্রকল্প নির্বাচকের নাম :- আশীষ ঘোষ

তত্ত্বাবধায়ক:- অধ্যাপিকা ড. বর্ষা বিশ্বাস

শ্রেনি: - স্নাতকোত্তর (চতুর্থ সেমেস্টার)

রোল নং:-1547

UID NO:-21010001012

REG NO :-02502 of 2019-20

শিক্ষাবর্ষ :-2022-24

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকাঃ	১-৩
প্রথম অধ্যায়ঃ- কবিকঙ্কন মুকুন্দ ও তাঁর চণ্ডীমঙ্গলের পরিচয়	৪-৫
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ- দেব-দেবী ও প্রান্তিক সমাজ জীবনের প্রসঙ্গ	৬-৮
তৃতীয় অধ্যায়ঃ- প্রান্তিক জীবন ভাবনায় সমকালীন পটভূমি	৯-১২
চতুর্থ অধ্যায়ঃ- সাহিত্য ও প্রাত্যহিক জীবনে প্রান্তিক মানুষের উজ্জ্বল উপস্থিতি	১৩-১৬
পঞ্চম অধ্যায়ঃ- কবিকঙ্কন মুকুন্দ ও তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে প্রান্তিক জীবনভাবনার স্বাভাবিক প্রয়োগ	১৭-১৯
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ-- প্রান্তিক জীবনভাবনায় কবির বিশিষ্টতা	২০-২১
উপসংহারঃ	২২-২৩
গ্রন্থপঞ্জিঃ	২৪

প্রাক্‌কথন

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত একটি ' - বিশেষ পত্রনির্ভর গবেষণাধর্মী প্রকল্পপত্র' আমাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই প্রকল্পটি আমাদের চতুর্থ বাংলা বিভাগের চতুর্থ সেমের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের করতে হবে। আমি - আশীষ ঘোষ বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর স্তরের চতুর্থ সেমের ছাত্র। রোল - 1547, UID - 22011001012. আমি যে বিষয়টি প্রকল্পপত্রের জন্য বেছে নিয়েছি -- তা হল - ' কবিকঙ্কন মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল: প্রান্তিক বাঙালির সমকাল' আমার এই প্রকল্প পত্রের যে বিষয় - চণ্ডীমঙ্গলে: প্রান্তিক ভাবনা। এই নিয়ে অনেক অনেক বই এর সাহায্য নিতে হয়েছে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি বিষয়টা ভালোভাবে উপস্থাপন করার। কিন্তু কতটা পেরেছি জানি না। কবিকঙ্কন সুন্দরভাবে প্রান্তিক ভাবনাকে উপস্থাপন করেছেন তাঁর কাব্যে। আমি সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

এই প্রকল্পপত্রটি লিখতে ~~আমি~~ আমার অনেক সময় লেগেছে। এটা অনেক সহজ ও সুন্দরভাবে লেখার চেষ্টা করেছি যাতে পড়লে পাঠক ভালোভাবেই বুঝতে পারে। এই প্রকল্পপত্রটি তৈরি করতে দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রম ও যাদের সাহায্য ছাড়া প্রকল্পপত্রটি সম্পূর্ণ হতো না তাদের কথা অবশ্যই স্মরণযোগ্য। যারা সাহায্য করেছেন তারা হলেন - বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের বাংলা বিভাগের সম্মানীয় অধ্যাপক মহাশয় ও অধ্যাপিকা মহাশয়া বৃন্দ। এছাড়াও আমাদের ~~গ্রন্থাগার~~ কলেজের গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্যের ~~অনেক~~ কথা স্বীকার করতেই হয়। এই সকলের সাহায্য ছাড়া প্রকল্পপত্রটি তৈরি করা সম্ভব হত না। আমাদের কলেজের মহাশয় - মহাশয়াবৃন্দকে জানাই ভক্তি ও শ্রদ্ধা। এবং সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রান্তিক জীবনভাবনায় সমকালীন পটভূমি

মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গলে' সমকালীন পটভূমিতে প্রান্তিক জীবন ভাবনা এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে অবস্থান করেছে। সমকালীন জীবন ভাবনায় তাদের যখন উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। সাধারণত দেখা যায় উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের জীবন ধারণ পদ্ধতি আলাদা। তাদের ভালো দিকগুলোকে তুলে ধরা হয়। তারা বসবাস করে ভালো জায়গায়, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া দাওয়া সবকিছুই উন্নতমানের। কিন্তু এবারে যখন তাদেরকে একটা পাশে সরিয়ে রেখে প্রান্তিক জীবনভাবনায় সঙ্গম নিয়ে আসা হল- তখন প্রান্তিক জীবনভাবনায় সেই সব মানুষদের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক পরিচ্ছদ কথা কবি তুলে ধরেছেন। এখানে দেখা যায়- এদের পোশাক হিসেবে পশুর চামারা এবং সাওয়া দাওয়া গাছের ফলমূল, শিকার করা মাত্র পশুর মাংস এবং শাকপাতা, খুদ কণা ইত্যাদি। সেই রকম দুরন্ত দেব এবং দুর্ধর্ষ দেব ভাবনাকে প্রান্তিক জীবনা- লেখ্যের মধ্যে কবিরা দেখাতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্যই কবিকঙ্কন ও অন্যান্য কবিরা দেখিয়েছেন- উচ্চবিত্তরদের পোশাক-পরিচ্ছদ খাওয়া দাওয়া, আচরণ, ব্যবহার, রীতি নীতি সবই মার্জিত ও শালীন। কিন্তু এরা যে অমার্জিত, অশালীন এটা কিন্তু কবিরা দেখাননি। কখনো কখনো সেই বর্ণনা করতে গিয়ে, আজকের দিনে আমাদের মনে হবে যে এটা কতটা স্বাতন্ত্র্য।

প্রান্তিক সমাজের প্রতিভু কালকেতু। কালকেতুর ভোজন অংশ দেখলে খুব অবাকই লাগে। কালকেতু সে বীর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বনের ভয়ংকর ও শক্তিমান পশুরাও বীর কালকেতুকে ভয় পায়। আর সেই কালকেতুর ভোজনও যে বড় মাপের আয়োজনে হয়ে থাকে এটাই স্বাভাবিক। কবি মুকুন্দ তাই জানিয়ে দিয়েছেন-

"শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।

ছোট গ্লাস তোলে যেন তেআঁটিয়া তাল ।।" ১

চতুর্থ অধ্যায়

সাহিত্য ও প্রাত্যহিক জীবনে প্রান্তিক মানুসের উজ্জ্বল উপস্থিতি

আমরা প্রাত্যহিক জীবনে বা আলোচনায় সেই জায়গায় যতগুলোই সাহিত্য দেখব সেখানে দেখি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বা মনসামঙ্গল বা আরো যে সাহিত্য সেগুলোতে দেব বা দেবী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।এরা কিন্তু সবাই কৌলিন্য বজায় রেখে সাধারণ আটপৌরে মানুষের সংস্রব থেকে নিজেরা বা ব্যবধান বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল। এই জায়গাতে প্রথম আঘাত করলেন কবিকঙকন মুকুন্দ। এবং সেই দেবতাদের যখন তিনি আঘাত করলেন তখন তিনি বোঝাতে চাইলেন যে - দৈনিক জীবনের অনুষঙ্গে এদেরকে এবং গৌরবময় উপস্থিতিকে আমরা লক্ষ্য করি। তথাকথিত উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তরা যে জিনিস খেতে চায়না,যে জিনিস দেখলে তারা ঘৃণা সহকারে দূরে সরে যায়, সেখানে প্রান্তিক সমাজ- জীবন এবং প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় 'আটপৌরে চরিত্রগুলি কিন্তু সেই ভাবনাকে, সেই সমাজটাকে, সেই প্রেক্ষাপটকটাকে নিজেদের শরীরের মধ্যে সামাজিকতার মধ্যে একদম আষ্ঠেপৃষ্ঠে রাখতে সক্ষম হয়েছিল এবং তা সুন্দরভাবে সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন কবিকঙ্গন সুকুন্দ তাঁর -চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে।

কলা সাহিত্যের আদিমুগ বা প্রাচীন যুগ অর্থাৎ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে চর্যাপদের মধ্যে ও প্রান্তিক সমাজজীবনের পরিচয় পাই। চর্যাপদের বিভিন্ন পদে এই প্রান্তিক জীবনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। চর্যাপদে ডোম, শবর, চণ্ডাল, সাঝি, শুরি প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর কথা উঠে আসে। চর্যাপদের ১০ নং পদে দেখি-

"নগর বাহিরি রে বোম্বে তোহোরি কুড়িআ।

ছোই ছোই জাহ সো ব্রাম্মনারিআ।।" ১ (কাহ্নপাদ)

আদি মধ্যযুগের একমাত্র সাহিত্য নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ও প্রান্তিক মানুষের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা সায়। সমকালীন লোকজীবনের ধারা প্রতিফলিত হয়েছে কাব্য মধ্যে এখানে বৃত্তিনির্ভর জনজীবনের পরিচয় তথা গোপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, কুমার, তেলি, নাপিত, বৈদ্য প্রভৃতি প্রান্তিক মানুষের কথ্য লক্ষ্য করা যায়।

আবার অন্যান্য সাহিত্য তথি- অনুবাদ সাহিত্য, মনসামঙ্গল, ধর্ম-মঙ্গল কাব্য, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে প্রান্তিক সমাজের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এইসব সাহিত্য গুলো বাদে কবিকঙ্কন মুকুন্দই সার্থকভাবে প্রান্তিক সমাজকে রূপ দিয়েছেন তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে।

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে প্রান্তিক সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের কথা উঠে এসেছে। এখানে দেখা যায় - দৈনন্দিন জীবন ধারণের জন্য যে সব সামগ্রী প্রয়োজন তা সমস্তই নিম্নমানের। যে খাবারগুলো উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তরা পড়তে চাই না বা দামী দামী পোশাক পরে। খাবারগুলোই দেখব প্রান্তিক মানুষের প্রিয় খাবার। যে পোশাক পরিচ্ছেদ উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তরা পরতে চাই না বা দামী দামী পোশাক পরে। সেই জায়গায় প্রান্তিক মানুষজনেরা সেইসব পোষাক তথা বলে যেগুলো বনে জঙ্গলে পাওয়া যায় সেই সব পোশাক পরে দিন কাটাত। উচ্চবিত্তরা দামী দামী খাবার খেত সে জায়গায় নিম্নবিত্ত বা প্রান্তিকরা গাছপালা, ফলমূল, পশুর মাংস তথা হেঞ্চি শাক, পালং শাক, কলমী শাক, পলতার শাক, পুই ডগা, নকুল ও গোধিকা পোড়া, পাকা তাল, চালিতার ঝোল হাড়ি হাড়ি আমানি, আলু ওলপোড়া, কচু করঞ্জা আমরা এইসব খেয়ে দিনযাপন করত।

ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।

কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া ।।" 2

প্রান্তিক সমাজের মানুষ জনেরা ভালো ভালো পোশাক পরতে পেত না। উচ্চবিত্তরা যে সব পোশাক কোনোদিনই পরেনি। সেইসব পোশাক ছিল এদের নিত্যদিনের সঙ্গী। এই কাব্যে ফুল্লরাকে দেখি হরিণের ছড়, পুরান খোসলা পরিধান পরে থাকতে হয়।

এই সমাজের মানুষদের চিরদিন দুঃখ কসেই কাটাতে হয়। কিরাত পাড়ায় ফুল্লরার কুটির ভেরেন্ডার ডাল আর পাতার ছাউনি দিয়ে তৈরি। এই ঘরে তারা বসবাস করত। যা যেকোনো সময় ঝড়ে উড়ে যেতে পারে।

কালকেতু ফুল্লরার সংসার চিত্র বর্ণনায় কবি দরিদ্র ব্যাধ সমাজের নানা সমস্যা ও যন্ত্রনার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কালকেতু শিকার করে, আর ফুল্লরা যোগ্য সহধর্মিনীর মতো মাংসের পসরা নিয়ে হাটে বিক্রি করতে যায়। কিন্তু তাদের দুঃখের শেষ নেই। ফুল্লরা দেবী চণ্ডীকে দুঃখের কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন-

"বৃথা বনিতাজনম বৃথা বণিতা জনম।

ধুলি ভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন।।

দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।

জানু ভানু কৃশানু শীতে পরিত্রাণ ।।"৩

বারো মাসেই ফুল্লরার কষ্টে কাটে। বৈশাখের ঝড়ে তার ঘর ভেঙে যায়, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচন্ড গরমে তার জল খাওয়ার সময় থাকে না। আষাঢ় মাসে ভালো মাংস বিক্রি হয় না, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে প্রচন্ড বর্ষায় মাংসের জল গায়ে পড়লে মাছি খায়, আশ্বিন মাসে অম্বিকা পূজা, এই ঘরে ঘরে মেষ ও ছাগল বলি হয় তাই মাংস কেউ কিনতে চায় না। কার্তিক অঘ্রাণ, পৌষ মাসের প্রচন্ড শীতে তার দেহে আচ্ছাদন থাকে না। ফাল্গুন মাসের মিলন মুখর পরিবেশে ও ফুল্লরার উদরের চিন্তা যায় না-

"বণিতা পুরুষ যত পীড়য়ে মদনে।

ফুল্লরার অঙ্গ পুড়ে উদর দহনে""৪

আর চৈত্র মাস সম্পর্কে কবি জানিয়েছেন-

" অনল সমান পোড়ে চায় ইতের খরা।

চালুসেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা ।।"৫

ফুল্লরা তাঁর এই বারোমাসের দুঃখের কথা দেবী চণ্ডীকে জানিয়েছেন। তবু দেবী এই বাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি। দেবী চণ্ডী স্বর্ণ গোধিকাররূপে কালকেতুর বাড়িতে আসে কালকেতু কে সাহায্য করতে। কিন্তু ফুল্লরা দেবীকে চিনতে না পেরে সতীন ভেবে তাড়ানোর কাছে চেষ্টা করে। সে তাঁর দারিদ্র্যের বর্ণনা শোনালেও যখন দেবী চন্ডী যেতে চাননি, তখন বুদ্ধিমতি নারীর মত ফুল্লরা দেবী চণ্ডীকে উপদেশ দিয়েছে-

" সতিনী কোন্দল করে। দ্বিগুণ বলিবে তারে

অভিমানে ঘর ছাড় কেলি।" ৬

এরপর ফুল্লরা কাঁদতে কাদঁতে হাটে যায় কালকেতুর কাছে। দেবীর রূপের কথা শোনায়। কালকেতু শুনে অবাক হয়ে ফুল্লরাকে ধমক দিলে ফুল্লরা ও দুকথা শুনিয়ে দেয়-

"পিপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।।"৭

কালকেতু বাড়ি এসে দেখে সত্যিই এক রূপসী কন্যা। কালকেতু ও তাকে চলে যাবার জন্য বলে। এরপর দেবী নিজ মূর্তি ধারণ করে কালকেতুকে তোমার দুঃখ দুর করিবার জন্য আমি আসিয়াছি ।তুমি বর মাগ।

'মানিক অঙ্গুরি লহ সপ্ত রাজার ধন।

ভাঙ্গায়া বসাই রাজা গুজরাট বন।।" ৮

তখন কালকেতুকে দেবীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করলেন। কালকেতুর দুঃখ গেল। কালকেতু গুজরাট নগর স্থাপন করলেন। দেবীর স্তব করলেন। কবিকঙ্কন মুকুন্দেই এই প্রান্তিক মানুষদের সুন্দরভাবে সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন। এর আগে এদের সমাজে বা বা সাহিত্যে কোনো কবি স্থান দেননি।

তথ্যসূত্রঃ-

১. চর্যাপদ- মণীন্দ্রমোহন বসু, পৃষ্ঠা-৮৭

২. কবিকঙ্কন মুকুন্দ রামের চন্ডীমঙ্গল- সৌমেন্দ্রনাথ সরকার, পৃষ্ঠা-৫৯

৩ . কবিকঙকন জীবনরসিক মুকুন্দবাম বিরচিত- চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা, সম্পাদনা সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১৯৫

৪. পূর্বোক্ত চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা, পৃষ্ঠা-১৯৫

৫. পূর্বোক্ত চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা, পৃষ্ঠা-১৯৫

৬ . পূর্বোক্ত চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা, পৃষ্ঠা-১৯৬

৭. পূর্বোক্ত চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা, পৃষ্ঠা-১৯৬

৮. পূর্বোক্ত চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা, পৃষ্ঠা-৮৪

কবিকঙ্কন মুকুন্দ ও তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে প্রান্তিক জীবন ভাবনার স্বাভাবিক প্রয়োগ

কবিকঙ্কন মুকুন্দও তাঁর চণ্ডীমঙ্গনে যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা হল- মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যে প্রান্তিক সমাজের মানুষদের 'বাস্তব চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। যা অন্য কোনো কবি বা সাহিত্যিক এদের কথা বলেননি। পরবর্তীকালে এইরকম চিত্র ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেখতে পেলেও-করিকঙ্কন মুকুন্দের মতো নয়। 'অন্নদামঙ্গল' রাজসভার কাব্য কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল একেবারে প্রান্তিক জীবনভাবনার বাস্তব চিত্র। কবি মুকুন্দ এই কাব্যের মধ্যে প্রান্তিক সমাজের নিখুঁত কর্ণনা করেছেন অন্ত্যজ শ্রেণীর চরিত্রগুলিকে নিয়ে। এই প্রান্তিক চরিত্রগুলি হল আখেটিক খন্ডে - কালকেতু, ফুল্লরা, ভাড়ু দত্ত এবং বণিক খণ্ডে-লহনা, খুল্লনা, দুর্বলা দাসী চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে।

"কালকেতুর চরিত্র পরিকল্পনার ভিতর দিয়াও মুকুন্দরাসের অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার জীবনে তাহার সহজাত ব্যাধ সংস্কারের সঙ্গ উচ্চতর কোনও জীবনাদর্শের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় নাই- সেজন্য তাহার চরিত্রটি নিতান্ত সহজ ও সরল। মুকুন্দরাম এককথায় তাহার পরিচয়টি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,

" শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।

গ্রাস তুলি তুলে যেন তে-আঁটিয়া তাল।" ১

কালকেতু' চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত। তিনি বীর এবং ব্যাধসমাজের নেতা। তিনি এই প্রান্তিক সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থাপিত। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির চরিত্র। তার চরিত্রে যেমন আদিমতা আছে তেমনি আছে আরণ্য ছাপ। মুকুন্দরাম সমসাময়িক কাল ও ব্যক্তিগত রুচিবোধ নিয়ে কালকেতু চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। তাই কালকেতুর শারিরিক বলই সম্বল। কালকেতু ছিল মহাবীর। তার ভয়ে শুধু শিশুরা নয়, বন্য পশুরাও ভীত। অসীম তার শক্তি। শিকারে সে অব্যর্থ। কালকেতু দেবীর আর্শীবাদে সাটি ঘুরে গাত ঘরের ধন পায়

এবং দেবী চণ্ডীর মর্ত্যলোকে পূজা প্রচার করেন এবং দেবীর আদেশে গুজরাটনগর স্থাপন করেন।

এই কাব্যে ফুল্লরা চরিত্রটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ।মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক সমাজের প্রতিভু হিসেবে ফুল্লরা কে তুলে এনেছেন কবিকঙ্কন ।ফুল্লরা গৃহ কর্মনিপুনা, তার গৃহকর্ম কেবল গৃহাঙ্গ নেই আবদ্ধ নয়। কালকেতু শিকার করে আনে ফুল্লরা সেই মাংস পোসরা দিতে কখনো যাই গোলাহাটে কখনো বা গ্রামের গৃহ পল্লীতে।

স্বামীর কর্তব্য ও প্রেমের প্রতি একটা তীব্র অধিকারবোধ ফুল্লরার সব কর্ম ও সহনশীলতাকে ঘিরে রেখেছে ফুল্লরা নারী স্বামী সোহাগিনী নারী ছদ্মবেশিনী চন্ডিকে দেখে তাই সে সপত্নী শঙ্কায় উৎকন্ঠিত হয়ে উঠেছিল।

তবে ফুলোড়া বঙ্গ নারীর মতো অবলাকুলের বালা নয়। মধ্যযুগে নারী হয়েও সে সাহসিকা ও পসারিনী। কালকেতুর সঙ্গে বনে গিয়ে পশু তাড়াতেও সে সক্ষম ।আবার মাংসের পসরা নিয়ে হাটে যেতে ও পথে পথে ঘুরতেও সে অপরাপ নয়, সে যে ব্যাধ রমণী ।তাই তার চরিত্রটিকে কবি সেভাবে তুলে ধরেছেন ।তার আচরণ ভারী সহজ সরল। দারিদ্রতার নিত্য সঙ্গী কিন্তু সহজ তার জীবন ।এমন জীবনের ছবি খুবই সুন্দর ভাবে এঁকেছেন -

"ফুল্লরা দু কাটা চাল মাগিলো উদার।

কালি দেহ বল্যা কৈল অঙ্গিকার।।"2

ফুল্লারার বারোমাস্যায় দেখা যায় ফুল্লরার বারো মাসের দুঃখের কাহিনী। ফুল্লরা দেবীকে বারো মাসের দুঃখের কথা বলে তার দারিদ্র লাঞ্চিত জীবনের কথা তুলে ধরে কালকেতুর গৃহত্যাগ করতে বলে তার সংসারে অভাব ঘরে খাবার কিছু নেই পশুর মাংস বিক্রি করে সংসার চলে এত দারিদ্র কষ্ট ও ছলনা সত্ত্বেও সে স্বামীকে ত্যাগ করেনি ফুল্লরা অন্ত্য সমাজের নারী। সে সমাজের সংসার ত্যাগ বা স্বামী ত্যাগ করার নিয়ম ছিল না। কবিকঙ্কন অসাধারণভাবে প্রান্তিক সমাজের এই চরিত্রটিকে তার কাব্যে উপস্থাপন করেছেন।

এই কাব্যে ভাড়ু দত্ত চরিত্রটিও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ভাড়ু দত্ত খল প্রকৃতির চরিত্র। এই খল প্রকৃতির দুষ্ট ব্যক্তিরা নীচতা ও স্বার্থপরতার জন্য কালকেতুকে অনেক নির্যাতন ভোগ করতে

হয়েছে। কিন্তু কবির যেন তার প্রতিও বিরূপতা নাই। তার সমস্ত অন্যায় আচরণকে তিনিও কৌতুক প্রসন্নতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। কালকেতু গুজরাট নগর পতন করেছে কত লোক এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে। তাদের সঙ্গে ভাঁড়ু দত্ত ও এসে হাজির হয়েছে। ভাড়ুদত্ত ভেট নিয়ে এসেছে। তার প্রথম আগমনটি যেন আবির্ভাব-

"ভেট লয়্যা কাঁচকলা পশ্চাতে ভাঙুর শালা
আগে ভাড়ুদত্তের পড়ান।
ভালে ফোটা মহাদম্ভ ছেড়া ধুতি কোচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশান।।
প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
সমন্ধ পাতায়্যা বলে খুড়া।
ছেঁড়া কম্বলেতে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া।। "৩

এখানে দেখা যায় তৎকালীন সময়ে কারো সাথে দেখা করতে গেলে ভেট নিয়ে যাবার প্রচলন ছিল। সেই সময়কালে ভেট হিসাবে ভাড়ু দত্ত কাঁচকলা নিয়ে যাচ্ছে। তা দেখে আমরা অবশ্যই বুঝতে পারি যে-এই চরিত্র গুলি একেবারে প্রান্তিক সমাজের বাঙালির সমাজ- চিত্রকে তুলে ধরেছেন। এই চরিত্রগুলিকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন একমাত্র কবিকঙ্কন মুকুন্দই। এর আগে মঙ্গল সাহিত্যে প্রান্তিক, সমাজের মানুষদের বাস্তব জীবনযাপন পদ্ধতি স্থান পায়নি।

তথ্যসূত্রঃ-

১. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা-

২. কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল। সৌমেন্দ্রনাথ সরকার, পৃঃ৭২

৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খন্ড) পৃ: ১১৪

ষষ্ঠ অধ্যায় :-

প্রান্তিক জীবনভাবনায় কবির বিশিষ্টতা

আসাদের আলোচ্য প্রকল্পে প্রান্তিক সমাদভাবনাকে নিয়ে কবিকঙ্কন মুকুন্দ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে প্রান্তিক জীবনভাবনা আসাদের চোখের মধ্যে দেখা হয়তো উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তের সেই ভাবনাকে অবলম্বন করে কবিকঙ্কন বা অন্য কোনো সাহিত্যিক বা কবি আমাদের কাছে দিতেন তাহলে সেটা হয়তো কালের ভাবনার নিরিখে আমরা মনে রাখতাম। কিন্তু পরবর্তী কালে আজকে আমরা যাদের নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি তারা কি সেরকম করে জায়গা পেতে পারত? তাহলে সেই জায়গাটাকে সেই কবিরা ঐ প্রান্তিক জীবনকে, প্রান্তিক সমাজকে, প্রান্তিক মানুষের অনুভূতিকে, তারাও যে মানুষ, তারাও যে সাহিতে উল্লিখিত হওয়ার দাবী রাখে। এই ধারণায় তারা জড়িত হয়েছিলেন বলে এই চরিত্রগুলোকে এর মধ্যে তারা যুক্ত করতে পেরেছিলেন।

উচ্চবিত নয়, মধ্যবিত নয় সমাজের তথাকথিত সাবলটার্ন বা প্রান্তিক মানুষেরা যার অন্যতম মধ্যমনি হলেন কালকেতু এবং অনুষঙ্গ। এই আনুষঙ্গিক জিনিসগুলো নিয়েই আমাদের আলোচ্য 'চন্দ্রীমঙ্গল' এবং তা রচনা করেনে কবিকঙ্কন মুকুন্দ। মুকুন্দের কাব্যের প্রশংসা করতে নিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন-

"মুকুন্দরাম কেবল সময়ের প্রভাব অতিক্রম করিতে, অতীত প্রথার সহিত আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে, অলৌকিকতার হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই একজন খাঁটি ঔপন্যাসিক হইতে পারেন নাই। দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।" ১

কবি মুকুন্দ যেভাবে তাঁর সাহিত্যের মধ্যে বাস্তব জীবনবোধের প্রান্তিক চরিত্রগুলি উপস্থাপন করেছেন তা অবশ্যই কাব্য না হয়ে উপন্যাস হতে পারত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন।

আগে উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তদেরই সমাজে দেখা হত। এদের কথায় সমাজে প্রবেশের অধিকার পেত। প্রান্তিক মানুষজনেরা বঞ্চিত দিল। অধিকারবোধহীন জায়গাতে ছিল। তারপর মানুষের চিন্তাধারার কনসেপ্ট এর পরিবর্তন হল। পরিবর্তন হতে হতে এদের সসম্মানে জায়গা দেওয়া

হল। তাদের আচার আচরণ, খাবার-দাবার, পোশাক- পরিচ্ছদ, সংলাপ, রুচি ব্যবহার, রীতি-নীতি, আদব-কায়দা প্রাত্যহিক জীবনচর্যা এবং আটপৌরে জীবনভাবনাকে এরা সসম্মানে তাদের কাহিনির মধ্যে লিপিবদ্ধ করলেন এবং সেই লিপিবদ্ধ শুধু নয় তাকে সে জায়গায় পৌঁছে দিলেন এবং আপামর জনসাধারণের কাছে তা পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহন করলেন। দেবতা বা দেবীকে পাশ কাটিয়ে নয়, তাদের মাথায় রেখেও এদেরকে নিয়ে যে সাহিত্য রচনা করা যায় এবং এদের কেও যে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, এদের জীবন ভাবনা ও যে আলোচনার দাবি রাখে সেটা কিন্তু এরা যে করতে পেরেছেন এটাই পথিকৃত। যদিও আমরা দেখি চর্যাগীতি থেকে সেই জিনিস আমাদের বাংলা সাহিত্যে শুরু হয়েছে। যদিও তা সার্থকতর শ্রেষ্ঠ রূপান্তর আমরা কবিকঙ্কনের মধ্যে দেখতে পাই এখানেই তার অন্যতম বিশিষ্টতা।

আমাদের আলোচ্য প্রকল্পে 'কবিকঙ্কন মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল': প্রান্তিক বাঙালির সমকাল।" কবি প্রান্তিক সমাজের অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন তাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এইরকম বাস্তব জীবনচিত্র (প্রান্তিক সমাজের) এর আগে সাহিত্যে দেখা যায়নি। এটা করতে পেরেছিলেন একমাত্র কবিকঙ্কন মুকুন্দই। এখানেই তার অভিনবত্ব।

তথ্যসূত্রঃ-

১. ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫৬. পৃঃ৯

উপসংহার

সমগ্র কাব্যের আলোচনার শেষে আমরা বলতে পারি সাহিত্যে উচ্চবিত্তরা থাকলেও ক্ষতি ছিল না মধ্যবিত্তরা থাকলেও ক্ষতি ছিল না কিন্তু আমরা তো মানুষ, ডারউইন তার বিবর্তনবাদে বলেই দিয়ে গেছেন মানুষ পরিবর্তনশীল। আমরা সমাজবিজ্ঞানের চোখেও হয়তো আজকে দেখি অন্তর্বিভাগ বা আন্ত: প্রেক্ষাপটে সমাজ একক হতে পারে না। একটার সঙ্গে আর একটা যুক্ত থাকে। এই যে সুক্ত থাকার প্রবণতা তাদেরকে একত্রিত করে মিলিয়ে দিয়েছে।

উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত থাকলে আমরা যেমন তাদেরকে দেখতাম সেই জায়গায় প্রান্তিক মানুষ বা প্রান্তিক জীবনকে কবি আমাদের কাছে এই রকমভাবে রূপ দিয়েছেন বলেই অন্যদের থেকেও আমরা দেখি যে এরা সমাজের তথাকথিত সেই জায়গা থেকে উঠে এসেছে। প্রান্তিক সমাজ থেকে উঠে এসে এরা যে সাহিত্যের মধ্যে সমাজের মধ্যে দেবতাদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার কথাকে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি এটা আসাদের কাছে করে দিতে সক্ষম হয়েছে। যার জন্য তার চরিত্রে, তার কাব্যে বর্ণিত উল্লেখিত প্রান্তিক জীবনালেখ্য আজকের দিনেও আমাদের কাছে উজ্জ্বলতম প্রতিভূ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কবিকঙ্কন সুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেই এই প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করতে পেরেছে। আর এখানেই কবিকঙ্কন মুকুন্দের অভিনবত্ব।

মধ্যযুগের সমাজ থেকে আজকের সমাজ পরিবর্তন শীল হয়ে গেছে। বলতে আমাদের অসুবিধা নেই যে সেই দুঃখী জীবন থেকে তারা আজকের দিনে সরে আসছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে যে বাস্তবতা আমরা পাই তার থেকেও কিন্তু আজকের সমাজ সেই তথাকথিত সাবলটার্ন বা প্রান্তিক তারাও কিন্তু সে জায়গার থেকে সরে আসছে। সরকারের জনমুখী সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য, সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাবার জন্য।

আজকে প্রান্তিক বলতে আমাদের অসুবিধা নেই যে সেই জীবন সঙ্গত মধ্যযুগে যে কষ্টসহিষ্ণু ছিল এবং সেই জায়গায় যে তারা নিজেদের সৌধ নির্মাণ করেছিল সেটা দুবাইয়ের বুর্জ খলিফাকেও

পিছনে ফেলে দেয়। কিন্তু আজকের দিনে সরকারের বিভিন্ন সামাজিক কল্যান মূলক প্রকল্প তথা-বিবেকানন্দ স্কলারশিপ, লক্ষীর ভান্ডার, রুপশ্রী কন্যাশ্রী, ট্যাব, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, কৃষক ভাতা, আবাস যোজনা বিভিন্ন রকম প্রকল্পগুলো তাদের সেই দুঃখের জীবন থেকে তাদের সুখী জীবনে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবিকঙ্কন মুকুন্দ তৎকালীন প্রান্তিক সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন। সেই সময়ের মানুষজনেরা প্রচন্ড রোদে, জলে, শীতেও মাঠে কাজ করে বেড়াত। তাই তাদের রোগ ব্যাধিত কম হতো। কিন্তু আজকের প্রান্তিক সমাজের মানুষজনেরা সেই জায়গা থেকে অনেকটাই সরে এসেছে, পরিশ্রম বেশি করে না কারণ সরকারের ঘোষিত সামাজিক প্রকল্প গুলি অনেকটা সাহায্য করছে। খাবারের কষ্ট অনেক কমে গেছে। কবিকঙ্কন মুকুন্দ তাঁর চণ্ডী 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে সার্থকভাবে প্রান্তিক সমাজের মানুষদের চিত্র তুলে ধরেছেন এবং এমানেই তাঁর সার্থকতা।

গ্রন্থপঞ্জি

১. কবিকঙ্কন বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সম্পাদনা সুকুমার সেন

2. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খন্ড)

৩. ভূদেব চৌধুরী - বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা

৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড) - সুকুমার সেন

৫. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস - শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য

৫. কবিকঙ্কন জীবনরসিক মুকুন্দরাম বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা -সম্পাদনা সুখময় মুখোপাধ্যায়।

৭. কবিকঙ্কন চণ্ডী - সম্পাদনা সনৎ কুমার নস্কর

৮. কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল - সৌমেন্দ্রনাথ সরকার